International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-II, March 2024, Page No.01-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i2.2024.01-17

নারীবাদী দৃষ্টি ভঙ্গিতে ২১ শতকের উপন্যাসে নারীর চরিত্রায়ন

ড. রুবিয়া খাতুন

সহকারি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্বমহাবিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract:

Now-a-day's woman's situation determination quite difficult but it is not impossible. This work tries to study the representation of women characters, in novels written of 21st century. Modern women are not only changing their status in novels but also in their real life, they grab their right from the patriarchal society. They have been breaking the rituals, taboos of society, which are made by the patriarchal society. Now they are not only liberal, open-minded in novels but also in their real life. They are ready for economic freedom; they are now self-dependent. Modern women have equal rights, equal dignity in employments, society. Patriotism is used by the ideologies of society for their own and has been discussed is in some of the chapters of this research work. How patriotism lives through coercion is also discussed here. Patriarchy is not only alive through coercion but also through persuasion and it is a powerful weapon. Michel Foucault shows us the castigation process has changed through the changes of economic system, also changed the process of practicing of power.

In the novels women's character are try to establish their natural rights, equal employment rights for women and men, freedom movement of a women, right to education, her legal rights and modern movement how 21st century women's are equal not only in a novels but also in our society now they are totally ready for fight with the society for their rights they are ready to become a single mother, they are very comfortable with live in together, divorce, stay alone they want to live their life according to their choice not by force of the society they are establishing their identity in the society.

Keywords: নারীবাদ, পিতৃতন্ত্র, র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম, গণ-বন্ধন, শামুকখোল, প্রহান, তিলোত্তমা মজুমদার, পারমিতা ঘোষ মজুমদার, শারদীয়া পত্রিকা।

বেগম রোকেয়া চেয়েছিলেন মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে যাক, মেয়েরা উকিল-বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক,অধ্যাপক, ডাক্তার হোক, সেই সময়ের সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে নারীরা পুরুষের অধীনস্থ ছিল,সেখান থেকে বেরিয়ে আসুক, এইটাই চেয়েছিলেন,তাঁর চাওয়া পূরণ হয়েছে। তিনি পুরুষ শাসিত তথা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যেভাবে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা থেকে তারা মুক্ত হোক। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত হউক, তারা বলুক 'আমরা আসবাব নই , আমরাও মানুষ' –এটি চেয়েছিলেন...কিন্তু তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে কী হয়েছে?... বর্তমান

সময়ে মেয়েরা অনেক শিক্ষিত হয়েছে, তারা উন্নতিতে ও অনেক এগিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় তারা পুরুষের ও ঊর্ধ্বে। কোনও কোনও জায়গায় পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরি করে কিন্তু পরিবারের কর্তা সেই পুরুষটিই রয়ে গেছে। এই সামাজিক চিন্তা-ভাবনা, সংস্কারের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভিক সময়সীমা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সেটাতে না গিয়ে বৈদিক যুগের কিছু সাহিত্য নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা যায় যেখানে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। সেই সময়ের মেয়েদের ১৬-১৭ বছর বয়সে বিয়ে হতো, বিয়ের আগে পর্যন্ত তারা বিদ্যা শিক্ষা লাভ করত, বিয়ে না করে সারাজীবন দর্শন ও নানান বিদ্যা চর্চা করতো, পিতার ঘরে থেকে যেত, শিক্ষা-দীক্ষা, যাগযজ্ঞ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল। পিতার সম্পত্তিতেও তাদের অধিকার ছিল। কিন্তু তাদের সামাজিক স্থান কী ছিল তা বলা হয়নি। (প্রাচীন ভারতে নরী ও ধর্ম, মানবী বিদ্যা, পৃ:১৮৫)

এ দেশে আজও বাবা-মা পুত্র সন্তান চায়, কন্যা সন্তান চায় না, কেবল এদেশে নয়,পাশ্চাত্যে এই ধারনা দেখা গেছে। শিক্ষা চাকরি প্রভৃতি বিষয়ে মেয়েদের ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে দেখা গেলেও এখনও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাবা-মা কন্যা সন্তানের অপেক্ষা পুত্র সন্তানের স্বাক্ষরতাকে বেশি গুরুত্ব দেন। -এই সকল ভাবনার পেছনে দুটি কারণ হতে পারে –পুত্র হচ্ছে বংশধর –এই ভাবনা টা কাজ করে, মেয়ে তো বিয়ে করে অন্য বাড়ি চলে যায়, বৃদ্ধ বয়সে ছেলের ওপরই নির্ভরতার আশ্বাস রাখে। আরেকটি কারণ হতে পারে, সাধারণ মানুষ, সমাজ কাঠামো আজও নারী ও পুরুষকে সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমান মেনে নিতে পারেনা। যদি সামর্থ্যের দিক থেকে এক না হয় তাহলে অধিকারের দিকেও অসমান থেকে যায়। আসলে আমরা নারীকে যে রূপে দেখে এসেছি সেটি হল 'মাতৃ-মমতা-স্নেহ-ভালোবাসার প্রতিমূর্তি'। আসলে নারী প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, বহু পরিমাণে সংস্কৃতির সৃষ্টি। সমাজ নামক বিষয়টি সংস্কৃতি দিয়ে তৈরি , নারী-পুরুষের এই ভেদাভেদের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ বিস্তর ইতিহাস, যেটাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এঞ্জলেস ও কার্ল মার্কস এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাটি খুব ভালোভাবে করেছেন নারীদের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে। পূর্বে এক সময় নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান বলবান ছিল, ছিল মাতৃ যুগ। মানব সমাজের সূচনা থেকেই নারী পুরুষের অধীনস্থ ছিল না। সেই সময় সমাজে শোষণ, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ছিল না, মানুষ মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত হত না। কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানব সমাজে শ্রেণী-শোষণ ব্যবস্থায় নারী পরাধীনতার মূল কারণ। এক শ্রেণীর মানুষ যখন অন্য শ্রেণীর মানুষের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করেছে, তখন নারী সমাজকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। উৎপাতদনশীলতা থেকে সরিয়ে গৃহকর্মের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এক সময় খাদ্যের জন্য মানুষকে নির্ভর করতে হত শিকারের ওপর, দল বেঁধে পুরুষরা শিকারে যেত, পরে এলো যুদ্ধ, সবকিছুতেই পুরুষদের ভূমিকাটা প্রধান। স্ত্রীরা থাকতো গৃহে-সন্তান পালন প্রভৃতি কাজে যুক্ত যা ছিল অনেক মায়া-মমতার-স্নেহের কাজ। ধীরে ধীরে নারীর আরও গৃহকোণে ঢুকে পড়ে ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে নারী-পুরুষের চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কারের ভেদাভেদ গড়ে ওঠে। মানুষ আপনার কল্পনা ও সংস্কারের দ্বারা সেটাকে আরও অনেক দূর বাড়িয়ে তুলেছে,তাই বলে যে নারী পুরুষ অভিন্ন নয়। এই ভিন্নতা সৃষ্টির দ্বায় কিছুটা সংস্কারের ও কিছুটা ইতিহাসের। (মার্কসবাদ ও নারী মুক্তি,নারী,তাহা ইয়াশিন,পৃ:৬৬)

'নারীবাদ' শব্দটি আজকাল বহু পরিচিত শব্দ। সাহিত্য মহলে নারীবাদ বহু চর্চিত-বিতর্কিত বিষয়। সাহিত্য জগত ছাড়াও সামাজিক আলোচনা বিষয়েও 'নারীবাদ' বহু আলোচিত। 'বাদ' শব্দযুক্ত ধারনাকে

সংজ্ঞায়িত করা বা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কাজ। 'নারীবাদ' বলতে কী বোঝায়; এই বাদ শব্দ যুক্ত থাকায় এটা কি এক ধরনের তত্ত্ব, না কেবলমাত্র আন্দোলন, যা পিতৃতন্ত্রের মোড়কে পুরুষের আধিপত্য থেকে নারীকে মুক্ত করতে চাওয়ার আন্দোলন। (নারীবাদ:বিভিন্ন ধারা,মানবী বিদ্যা,পৃ:৩৮) এক কথায় বলা যায় নারীবাদ মূলত নারীর মুক্তির জন্য কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের জন্য গড়ে তোলা এক তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগগত দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল -লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে। নারীবাদের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি বিষয় হল:

১. 'পিতৃতন্ত্র' বলতে বোঝায় পুরুষের আধিপত্যবাদ যা প্রতিক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নারীকে। সামাজিক প্রতিধ্বনি শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় পরিসর ব্যবস্থা, এছাড়া আইন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, প্রসার মাধ্যম - সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্র একটি সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতির একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিপীড়ন করে, শোষণ করে। বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গের্ডা লার্নার "the creation of patriarchy"(১৯৮৬) গ্রন্থে বলেছেন যে পিতৃতন্ত্রের অধীনে পুরুষকে নারীর তুলনায় স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট ভাবার জৈব নিয়ন্ত্রণবাদী সিদ্ধান্ত প্রস্তরযুগ থেকে বর্তমানে একই ভাবে আছে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস তাঁর "the origin of the family, private property and state" গ্রন্থে বলেছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের জন্য নারীরা বশ্যতার সূত্রপাত। মাতৃসত্ব যেদিন পরভৃত হয় সেদিন পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় হয় । গৃহের কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে চলে যায়, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং নারীর দাসত্ব প্রথা চালু হয়।

২. পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যাক্তিপরিসর ও গণ-পরিসরের মধ্যে বিভাজন বিদ্যমান। ব্যাক্তি-পরিসরে আবেগ আর গণ-পরিসরে যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। ঘরের ভেতর নারী আর ঘরের বাইরের সমাজ পুরুষের এই ধারনা নারীবাদীরা মানতে পারেন না বা বিশ্বাস করেন না। বৈপ্লবিক নারীবাদী তাত্ত্বিক কেট সিলেট বলেছেন যে, যেখানেই ক্ষমতা-সম্পর্ক উপস্থিত থাকবে, সেখানেই রাজনীতি উপস্থিত থাকবে।

৩. নারীপুরুষের সহজাত শারীরিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র, সেইজন্য দু'জনের সামাজিক ভূমিকাও আলাদা। নারী পুরুষের মত শারীরিকভাবে সবল নয়, তাদের পরিবারের কাঠামো সীমাবদ্ধ, সন্তান জন্ম, প্রতিপালন করা কাজ-এই সমাজের সৃষ্টি জৈবিক নির্ধারনবাদকে আক্রমণ করে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা । লিঙ্গ বৈষম্য একটা বড় সমস্যা এককথায় বলা সম্ভব নয়, তবে এটা বলা যায় যে এটি কেবল ভৌগোলিক ভাবে নয়, চিন্তার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম স্তরে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

অ্যারিস্টটলকে দর্শন ইতিহাসে সাম্যের প্রবক্তা রূপে স্মরণ করা হলেও তাঁর লেখায় লিঙ্গ বৈষম্য সূচক উক্তি পাওয়া যায়। 'পলিটিক্স' গ্রন্থে বলেছেন যে, মুক্ত পুরুষ ও ক্রীতদাস, পুরুষ, মহিলা, প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু সকলেরই মনের বিভিন্ন অংশ আছে, তাদের যৌক্তিক নিয়ামক অংশ, অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রিত অংশ আছে, কিন্তু মানুষ ভেদে তা বিভিন্ন ভাবে আছে। (নারীবাদী দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট, নৈতিকতা ও নারীবাদ, শেফালী মৈত্র,পৃ:৩০)

৪. সাম্য বা সমতার দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল শিক্ষার সম-সুযোগ, সমান রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, গৃহের বাইরে কাজের সুযোগ, আইনি সাম্য ইত্যাদি। নারীকে ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হল এদের লক্ষ্য।

৫. নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যৌনতা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতিয়ার। নারীবাদী তাত্ত্বিক ম্যাকিনন বলেছেন - 'Sexuality is to feminism what work is to Marxism, that which is most one's own; yet most taken away'. (George Ritzen, 1982, Modern sociological theory, Megrew Hill company.) নিজের শরীর, যৌনতা, কামনা,বাসনা, প্রজনন- সবকিছুর ওপর নারীরা নিজের নিয়ন্ত্রণ, অধিকার চায়।

৬. অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নারীবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও অঙ্গ। নারীরা কম পরিশ্রম করে না অথচ পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পায়। আবার কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা ও যৌন নিগ্রহের শিকার হয়, যদিও এর বিপরীত দেখা যায়। আবার সেটা তবে গার্হস্থ্য পরিশ্রমের কোনও মজুরি পায়না। (নারী ও শ্রম, মানবী বিদ্যা, পৃ:১৩৩)

নারীবাদের বিভিন্ন তরঙ্গের সময়ে বিভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে নারীবাদের প্রধান ধারাগুলি হল - উদারনৈতিক নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, বৈপ্লবিক নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ । এছাড়া পরবর্তী সময়ে নারীবাদের প্রধান ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় কতকগুলি নতুন ধারা - মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ, উত্তর-আধুনিক নারীবাদ, পরিবেশ প্রধান নারীবাদ।
উদারনৈতিক রাষ্ট্রীয় দার্শনিকের তত্ত্বকে বলা হয় ধ্রুপটি উদারনীতিবাদ। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মানুষ বলতে কেবল পুরুষ নয়, নারীও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত - এই বিষয়টির ওপর জোর দেয়। পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করে।

এঙ্গেলসের মতে শ্রেণী বিভাজন ও নারীর বশ্যতা দুটিই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস সামাজিক বিবর্তনের তিনটি স্তর ভাগ করেছেন আদিমতা, বর্বরতা, ও সভ্যতা। মার্ক্সিয় নারীবাদীরা মনে করেন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজের প্রয়োজনে নারীকে গৃহমুখী ও গৃহবন্দী করে রাখে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা তাদের চিন্তাধারা মৌলিক সূত্রগুলি গ্রহণ করে মার্ক্সবাদ থেকে এবং সেগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে। শ্রেণী ও লিঙ্গ সম্পর্কের আধারে নারীর অধীনতার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করে।

বৈপ্লবিক নারীবাদ মনে করে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভক্তি নয়, লিঙ্গ ভিত্তিক দ্বন্দ্ব প্রাথমিক ও প্রধান। সিমন দ্য বোভয়ারের 'the second sex' (১৯৪৯) আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। তিনি সমাজতন্ত্রী নামে পরিচিত, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিক ও নারীর মুক্তি সম্ভব, তাঁর এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে।

প্রচলিত ভাবে ভাবা হয়, নারী পুরুষকে আকৃষ্ট করে বিবাহ করা ও অর্থ নির্ভরতার জন্য বিয়ে টিকিয়ে রাখা দরকার। এই ধারনাটি তারা ভাঙার চেষ্টা করেন। Gynocentric নারীবাদীরা বলেন সামগ্রিকভাবে সমাজের গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণ করা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের বিষয়টি তুলে ধরা।

Eco-feminism শব্দটি ১৯৭০ এর দশকে প্রথম ব্যবহার করা হয় ফরাসী নারীবাদী ফ্রাংসোয়াজ দোবান। এর উৎস প্রাগৈতিহাসিক যুগ। যেখানে পুরুষ-তন্ত্র সমাজের পুরুষেরা নারীদের শোষণ, নিপীড়ন, অবমাননা করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরিবেশ প্রধান নারীবাদ বহুভাবে আলোচিত বিষয়। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের এই আন্দোলনগুলি Eco-feminism-র ভিত্তি গড়ে তুলেছে, যেমন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে মেধা পাটকরের ভূমিকা।

শ্রেণী শোষণের ভিত্তিই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার প্রবর্তন। মানুষ যখন উৎপাদন শিখে উদ্বৃত্ত সম্পদ গুছিয়ে রাখতে শেখে তখন বাড়তি সম্পদের মালিকানা পুরুষের হাতে জড়ো হতে থাকে। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের হাতে অন্য শ্রেণী দাস-এ পরিণত হয়। ঠিক এই সময় নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হল। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের – দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 'পুরুষ-তন্ত্র' ব্যবস্থা মূলকেন্দ্র হয়ে উঠেছে ও শোষিত শ্রেণীর পুরুষরা আর নারীরা শোষিত হয়ে এসেছে। ৬৫, ৬৬ নারী, মার্কসবাদ ও নারী মুক্তি

নারীবাদ তুলনামূলক ভাবে একটি আধুনিক ধারণা। কবে থেকে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে বলা ঠিক সহজ নয়। তবে 'নারীবাদী' শব্দটি ১৮৭১ সালে ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন – পুরুষদের জন্য। পুরুষ প্রজনন অঙ্গটি সঠিকভাবে গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। 'শরীর নারী সুলভ' হয়ে উঠেছে বলা হয়। ১৮৭২ সালে একজন নারী বিদ্বেষী লেখক প্রথম প্রয়োগ করেন ব্যভিচারী মহিলাদের আচরণকে পুরুষালী আখ্যা দিয়ে তিনি বিষয়টিকে নারীবাদী আখ্যা দেন। 'নারীবাদী' শব্দটি প্রথম যে অর্থে ব্যবহার হক না কেন ধীরে ধীরে শব্দটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। (নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব, মানবী বিদ্যা,পৃ:৯৪)

নাট্যকার আফ্রাবেল (১৬৪০-৮৯), চিন্তাবিদ মেরি অ্যাষ্টেল (১৬৬৬-১৭৩১)-কে আধুনিক নারীবাদী প্রবক্তা হিসেবে দেখেন পশ্চিমের প্রথম নারীবাদী তাত্ত্বিকরা। দার্শনিক দেকার্তের দর্শন মেরি অ্যাস্টেলকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল পুরুষ ও নারী, উভয়েই সমানভাবে যুক্তিবাদী চিন্তা করতে পারে। নারীদের সঠিকভাবে শিক্ষাদান করতে পারলে তারা নিশ্চিতভাবে যুক্তিবাদী চিন্তাও মননের অধিকারী হবে। এই সবের জন্য নারী-পুরুষের শারীরিক বা কাঠামোগত প্রভেদকে দায়ী করা উচিত নয়। (তদেব:৯৫,মানবী বিদ্যা)

সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্য নিয়ে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে। সত্তরের দশক থেকে শুরু হওয়া 'নিউ ওয়েভ ফেমিনিজম' (new wave Feminism) বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এর আগে মূলত এই আন্দোলন কেবল দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর পর তার সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, জেহাদের সঙ্গে যুক্ত হল concepts (কনসেপ্টস) বা ধারনার স্তরে পরিবর্তনের দাবি। নারীবাদীতত্ত্বের মধ্যে যে বিভিন্ন দিক দেখা যায় তার প্রতিফলন বিভিন্ন ধরনের সমাজে বিভিন্ন ধরনের নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে দেখতে পাই।

নারীর সমস্যা নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বিশেষ করে চিন্তা-ভাবনা ও প্রতিবাদ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ১৭৬০ এর শিল্প বিপ্লবে মহিলারা কিছুটা হলেও সুবিধা পায়। মেয়ের রুজিরোজগারের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বেরতে থাকে। বিভিন্ন কলকারখানা যেমন- কয়লাখনিতে শিশু ও মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত হয়। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে নারীরা মূলত বয়ন শিল্পে, বিশেষ করে সুতো কাটা ও বোনার কাজ, কৃষিকাজ করত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন যন্ত্রপাতি আসে। মেয়েরা পুরুষের তুলনায় বেশি সময় দিয়ে কাজ করত, কিন্তু তুলনামূলক কম মজুরি পেত, আবার অনেকে বলেন কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক শোষিত হত। বলা যায়, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদের উত্তরণে শিল্প-বিপ্লব এক বিরাট ভূমিকা নেয়, যা মেয়েদের বা মহিলা শ্রমিকদের অনেক মাত্রায় প্রভাবিত করেছিল। ১৭৮৯ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ১৭৯৫ কিংবা ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে রাজতন্ত্র বিরোধী বেশ কিছু আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যেগুলি ফরাসী বিপ্লব নামে

পরিচিত। এই আন্দোলন রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা আন্দোলন করে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ গর্জে ওঠে। এই আন্দোলনে মহিলারাও বিপুল পরিমাণে অংশ গ্রহণ করে। ফরাসী বিপ্লবকে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ধরা যায় কারণ, সেখানে কেবল রাজতন্ত্রের বিরোধিতা নয়, তার সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারের অবসান ও নারীর অধিকারের জন্য অনেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলন প্রথমে ব্রিটেন ও পরে আমেরিকায় মহিলারা সংগঠিত হতে থাকে, বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। এই সময় নারীরা কিছু জয় লাভ ও করেছিল যেমন, রাজনৈতিক ক্লাব গড়ে তোলা, কিন্তু এরপর শুরু হয় ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন অর্থাৎ আইনগত অধিকার চায়, কিন্তু সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না। তারা স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। সন্তানের ওপর কোনও আইনি অধিকার নেই। স্বামীদের সাহায্য করাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ।*

এই সময় নারী আন্দোলনের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হলেন মেরি ওলস্টোনক্রাফট (১৭৫৯-১৭৯৭)। তিনি প্রথমে ১৭৮৩-তে লন্ডনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন কিন্তু সে স্কুল বেশিদিন চলেনি। তারপর প্রায় দশ বছর পর ১৭৯২-তে মেয়েদের অধিকারের সমর্থনে বই লেখেন –'A vindication of the Rights of women' -এ ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন নারী সম্পর্কিত প্রগতিশীল কথা বার্তার জন্য। পরবর্তীকালে তিনি নারীবাদী আন্দোলনের আইকন হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার ঠিক একবছর আগে ১৭৯১ সালে অলিম্প দ্য গজ (Olympa de Gouges ১৭৮৪-১৭৯৩) 'Declaration of the Rights of woman' বইটিতে সরকারের চোখে, আইনের চোখে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকারের দাবি রাখেন। সমাজ যেভাবে নারীচরিত্র ও নারী ভূমিকাকে গঠন করে তা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন এবং তা থেকে নারীকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারের কথাও সুস্পষ্টভাবে বলেননি, তিনি মহিলাদের ঘর-গেরস্থির কাজকর্ম থেকে বেশি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মেরি ওলস্টোন ক্রাফটের রচনার প্রায় ৮০ বছর পর গ্রেট ব্রিটেনে নারীর অধিকার নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল তার পেছনে ছিলেন জন রাসকিন ও জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা। এঁরা দু'জন নারীর অধিকার নিয়ে লিখলেও তাঁদের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। মিল তাঁর রচনায় 'The Subjection of women'-এ নারীর যৌনতা বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি উদার নীতিবাদী তাত্ত্বিক। স্বাবাভিকভাবেই ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার সমর্থক। তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেন। নারী শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের এগিয়ে আসা উচিত, নারীর কর্ম সংস্থানের অধিকার থাকা উচিত। মিলের লেখাকে বৈপ্লবিক মনে করা হয়েছিল, পরে যা মেরি বলেছেন। (নারীবাদী দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট,নৈতিকতা ও নারীবাদ,পৃ:২২)

ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতক থেকে নারীদের অধিকার নিয়ে এক এক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদ গড়ে উঠে। এই সময়ে ব্রিটেনে ও যে নারীবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল তার প্রমাণ উদারপন্থী নারীবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই নারীবাদ শব্দটি আরও প্রচলিত হয়ে যায়, নারীরা আরও সচেতন হয়ে ওঠে তাদের দাবী আন্দোলন নিয়ে। বিশ্বরাজনীতি যে দীর্ঘ ইউরোপের প্রাধান্য কমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। আবার বিশ্বযুদ্ধ শেষের দিক থেকে ঔপনিবেশিকতার অবসান হতে থাকে। অনেক রাষ্ট্রে নারীরা ভোটাধিকার পায়। সিমোন দ্য বভোয়া-র কাছে

কামু মন্তব্য করেছিলেন নারীর পিছিয়ে থাকার দরুন পুরুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি, উপযুক্ত সঙ্গিনীর অভাব।

কিন্তু ভোটাধিকার অর্জন করলেও প্রকৃত ক্ষমতা উপভোগ থেকে নারীরা বঞ্চিত থাকে। ঠিক এই সময় সিমন দ্য বোভয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) ও কেট মিলেট (১৯৩৪) তাদের রচনার মধ্যে দিয়ে নারীবাদী তত্ত্বকে নতুন রূপ দেন। নারীবাদী তত্ত্বের উদ্ভব, বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় নারীবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের লেখায় আসন পেয়েছে , সমৃদ্ধ হয়েছে। এগিয়ে চলা যেমন সব সময় সমান নয়, তেমনি বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, এমনকি কখনও পরস্পর বিরোধী মতও নারীবাদী তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নারীবাদী তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রে অনেক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। উনবিংশ শতকে যে সকল বিষয়গুলি নিয়ে নারীরা আন্দোলন শুরু করেছিল যেমন, নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষালাভ, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা- তা প্রায় অনেকটাই অর্জন করেছেন। তবে এই নয় যে, নারীরা সব কিছুই 'পেয়ে গেছে' এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য থেকে সমাজ মুক্ত। ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেটি ফ্রায়ডান-এর Feminism Mystique বইটি প্রকাশিত হয়। এই সময় শীলা বোরথাম বলেন যে, পুরনো নারীবাদের সমানাধিকারের দাবিতো ছিলই তবে আরও বেশি কিছু ছিল। এই সময় নারীরা অনেক সচেতন ও পূর্বে নারীরা অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সংস্কারপন্থী ছিল, ধীরে ধীরে তারা আরও যৌথভাবে বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নারীদের অধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে ভাবতে নারীবাদ আন্দোলনের সূচনা। কিছু পুরুষদের লেখা ও কিছু উচ্চবিত্ত মহিলাদের লেখা কাহিনী থেকে সেই সময়ের মেয়েদের দুর্বিসহ জীবন সম্পর্কে জানা যায়। নারীরা উৎপীহড়িত, নিপীড়িত ও ধর্মীয় সংস্কারের বলি হয়ে এসেছে দীর্ঘদিন, ধর্মীয় মৌলবাদ, কুসংস্কার, সতীদাহ প্রথা, শিশু বিবাহ, বহুবিবাহ, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতির বলি হয়ে এসেছে নারীরা। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ গভীরভাবে অর্থনৈতিক শোষণের পথ সুগম করে দেয় ভারতীয় সমাজের সমস্ত কাঠামো ভেঙে যায়, ঔপনিবেশিক শোষণ গ্রামীণ সমাজকেও ভেঙে দেয়। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আলো প্রবেশ করে। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও young Bengal Group, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে - দয়ানন্দ সরস্বতী, গুজরাটের নির্মল দুর্গারাম, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, বেহরামাজ মালাবারি, কেশব কার্ভে প্রমুখ ব্যক্তিরা উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের নেতারা পাশ্চাত্য উদারনীতি বাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম থেকেই তাদের কাজকর্মে মহিলাদের নিয়ে আস্তে চেষ্টা করে। কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে বম্বেতে (১৮৮৯)পাঁচজন মহিলা প্রতিনিধি -কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, পণ্ডিত রামাবাই, বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ, শ্রীমতী নিকম্বা অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণও চোখে আকর্ষণ করে। এই সময় ভগিনী নিবেদিতা, সরলা দেবী, বিকাজি রস্তাম, কে° আর° কামা প্রমুখ নারীরা নারীমুক্তি ও নারীবাদের উল্লেখযোগ্য।* ১৯২৯ সালে নারীরা ভোটাধিকার পেলেও সেগুলি কিছু শর্ত সাপেক্ষ হয়ে ওঠে, যেমন- ১. নারীকে বিবাহিত হতে হবে, ২. তাকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে, ৩. শিক্ষিত হতে হবে। প্রায় ২০,০০০ মহিলা গ্রেপ্তারকরণ করেন এবং গান্ধীজী নিজেই বলেন যে, the role women played in the freedom struggle should be written in letters of gold... গান্ধীজী বলপূর্বক নারীদের বিয়ে নিয়ে বলতে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার কথা বলেন... জোর করে কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায়। মেয়েদেরকে নিজের জীবিকা উপার্জনের উপযোগী শিক্ষা না দেওয়াও পিতা-মাতার পক্ষে অন্যায়।

বিবাহ অস্বীকার করলে কন্যাকে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করবার অধিকার কোনও পিতা-মাতার নেই।... নারীকে আশ্রয়ের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন নেই। (হরিজন,১৫/০৯/১৯৪৬,বলপূর্বক বিবাহ দান,মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী,পৃষ্ঠা:১৭৮, নারী ও সামাজিক অধিকার)

রাডিকাল ফেমিনিজম-এ দেখা যায় মেয়েরা পুরুষের সমতুল্য হওয়ার জন্য পুরুষদের মত পোশাক-আশাক, জিনস, সিগারেট, গাড়ি চালানো প্রভৃতি বিষয়গুলি গ্রহণ করেছে। তারা কেবল একটা কথা বোঝাতে চেয়েছেন, তারা মানুষ, কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে বস্তাবটা অনেকটাই পাল্টে গেছে, নারীরা ঘর-সংসার সহ শিক্ষা, চাকরি, পোশাক-আশাক, সমাজে মান-সম্মান এককথাই স্থান পেয়েছে। বর্তমানে তাদের লড়াই হল Self reorganization অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগত বাস্তবতারন হল মূল কাম্য। এই সময়ের অনেক সমস্যার মধ্যে একটা প্রধান সমস্যা হল সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। পুরুষেরা নারীদের স্বাধীনতা দিয়েছে, অনেক দিয়েছে, সত্য কথা কিন্তু ততটুকুই দেয় যতটা তারা প্রয়োজন মনে করে। পুরুষেরা সুন্দরভাবে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য সমর্পণের খেলা খেলে চলেছে; নারীরা তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছে, আবার অনেক নারী রয়েছে যারা যতটুকু স্থান দখল করেছে, সেই জায়গাটা আরও শক্ত করে ধরে আরএকটু জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে, তারা শান্তভাবে মৃদু লড়াই চালিয়ে একটা ক্ষমতাশালী শ্রেণী হয়ে উঠেছে, যেখানে তারা আত্মনির্ভরশীল। নারীর পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের লড়াই বা ব্যক্তিগত পরিচয় তৈরি করা, আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার.... এই সকল বিষয়ে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল পরিবার, নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন যা আমরা একবিংশ শতাব্দীর শারদীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক উপন্যাসে দেখি। পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণের চেহারাটা যে পাল্টে পাল্টে যায় তা নারীদের খেয়াল থাকে না। এক ধরনের নির্যাতন বন্ধ করতে সক্ষম হলে আর এক রূপ নিয়ে পুনরায় নির্যাতন চলতে থাকে। সতীদাহ বদলে-বধূহত্যা, এখন বধূহত্যা তুলনায় গণ ধর্ষণের ঘটনা দেখা যায়।

নারীদের ওপর পুরুষের আধিপত্য, সামাজিকভাবে নারী পুরুষ নির্ভরশীল এই মনোভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যৌনতা, লিঙ্গ সমস্যাগুলিকে হাতিয়ার করে কাজ করে চলেছে পুরুষ-তন্ত্র সমাজ। বর্তমান সময়ে নারীরা যৌনতা, নিজ শরীর, কামনা-বাসনা, প্রজনন সবকিছুতেই অধিকার পেয়েছে, নারী-পুরুষের এই অধিকার, স্বাধীনতার খেলায় একটা সামাজিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে – সেটা হল, নারীও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরিচয় গড়ে তোলা, আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার ব্যস্ততা। কেও কারো কাছে ছোট, নত হতে রাজি নয়। পুরুষেরা ততটাই জায়গা দিচ্ছে, যতটা তারা প্রয়োজন মনে করছে, আবার নারীরা যে স্থানটা পায় সেই জায়গাটা আরও শক্ত করে দখল করার চেষ্টা করছে। নারী-পুরুষের এই পৃথক চিন্তা-ভাবনায় সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবার। একে অপরের ব্যক্তিগত পরিচয় খুঁজতে গিয়ে ভেঙে যাচ্ছে পরিবার, মানিয়ে নেওয়া, একে-অপরকে বোঝা ... এই গুলি কেবল শব্দ হয়ে রয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীর শারদীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক উপন্যাসে এই বিষয়গুলি দেখা যায়, যেখানে নারীরা ক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যৌন সম্পর্ক সবকিছুতেই নিজের সিদ্ধান্ত নেয়, এইখানেই পুরুষের সঙ্গে নারীর ভেদাভেদ তৈরি হচ্ছে, তাদের এই চিন্তা-ভাবনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যের কারণে পরিবার ভেঙে যাওয়ার ট্রেন্ড দেখা যায়, একাধিক উপন্যাসে। পরিবার ভেঙে যাওয়া,নারীর স্বেচ্ছায় আলাদা হয়ে যাওয়া যেন একটা পুরুষ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ধ্বনি।

নারী পুরুষের দ্বন্দ্বে সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সম্পর্কের রূপ ভাষাও বদলে গেছে, একসময় নারীরা যৌনতার জন্য পুরুষ নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে তোলার জন্য একই লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক বা স্বেচ্ছাচারী পুরুষের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাচারী নারী হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। একবিংশ শতাব্দীতে এই সকল বিষয়গুলোর অনেক উদাহরণ বাস্তব জীবনে দেখা যায় ও শারদীয়া উপন্যাসে লেখিকাদের কলমে অনেক ধরা পড়েছে। -সমকামিতা, বহু সম্পর্ক কেবল একটি পুরুষ নয়, নারীরাও রাখতে পারে, শৈশবে শারীরিক আকর্ষণ, স্বেচ্ছায় গর্ভবতী হয়ে ওঠা .... ইত্যাদি। পিনাকী ঠাকুরের 'কলঙ্ক রচনা'তে দেখি – একজন পেসেন্ট ও নার্স কর্মচারীর মধ্যে সম্পর্ক -

(অঞ্জলি, তানিয়া)

অঞ্জলি আর বারো নম্বরের তানিয়া। দু'জনেই দু'জনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওষ্ঠ খুঁজে নিচ্ছিল সম্মতি, আর অঞ্জলি বারবার বলছিল তানিয়াকে, তনু আর একটু জোরে।... দু'জনেই কি লেসবিয়ান?... দু'জনেই যদি আনন্দ পায়, কোনও ভাবে,... ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। (তদেব, পৃ: ২৪২)

যৌন-সম্বন্ধ যে নারী-পুরুষ হতে হবে-এটা তো সমাজ প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা নিয়ম, সেই নিয়ম মানুষের সৃষ্টি, সেটা প্রকৃতি নয়, মানুষ বলতে পুরুষ-তন্ত্র বোঝায়। প্রেম দৃশ্য বা ভিন্ন লিঙ্গকতার প্রেম, দেখানোর মানে সমাজ যে লিঙ্গ রচনা করে, সে কতটা কৃত্রিম শারীরিক কিংবা প্রাকৃতিক যৌনতার থেকে তা কতটা পৃথক সেটা বোঝা যায়, একবিংশ শতাব্দী বলে নয়, নারীরা যখন থেকে লেখালেখির সুযোগ পেয়েছে তখন থেকে তাদের কলমে একটা প্রতিবাদ দেখা গেছে। তারা বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছে সমাজকে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য হল পুরুষ-তন্ত্র সমাজের ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা। সমাজের নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, সকল ব্যবস্থা পুরুষ-তন্ত্রের সৃষ্টি এই সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে নারীরা এক সময় পুরুষের মত পোশাক পরিধান, চলাফেরা দিয়ে শুরু করে নারীদের প্রতিবাদ। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই প্রতিবাদের রূপটা অনেকটা বদলে গেছে। নারীরা কেবল পোশাকে আটকে নেয়, তারা এখন অনেক বেশি মুক্ত মনের, খোলা-মেলা, এখনকার সাহিত্যিকরা প্রতিবাদগুলো অনেক স্পষ্টভাবে তীক্ষ্ণ স্বরে করে। এখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে আর চোখ লজ্জা, সমাজের ভয় কম, তারা মনের কথা বা সমাজ বিরোধী কথা আর ঘুরিয়ে বলে না, সোজাসুজি বলে। এই একবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসগুলোতে তার প্রমাণ প্রচুর রয়েছে। আজকালকার এই একবিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক যুগে ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের চরিত্রগুলি নায়িকারা আর ঘর-সংসারের মধ্যে আটকে নেয়, নায়িকাদের নজরে স্বামী-সংসার-পরিবার-মান-সম্মান এই সব বিষয়গুলির গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। তাদের কাছে নিজের ভাল লাগা, নিজের জন্য বাঁচা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা-মনের মত করে বেড়ানো, কাউকে তোয়াক্কা না করা বিষয়গুলি দেখা যায় এবং তারা মনে করে এই রকমভাবে চলাফেরা করা, পুরুষের ওপর আর নির্ভরশীল না থাকা, আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা যেন নারীদের জয়। দীর্ঘদিনের পুরুষ-তন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ের জয় উৎসব যেন তারা পালন করে। এখন আবার তাদের আন্দোলনের শুরু ক্রমশ যৌন সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌন সম্পর্কের জন্য একজন নারী ও অপরজন পুরুষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তারা যেন এই ধারনাটা ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে। নারী ও পুরুষ মিলে যৌন সম্পর্ক হয় এটা তো পুরুষ-তন্ত্র সমাজের সৃষ্টি নিয়ম, তারা এই ধারনাকে ভাঙার চেষ্টা করছে। আবার বলতে গেলে বলা যেতে পারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রাকৃতিক কিন্তু সেখানে যদি একি লিঙ্গের মধ্যে প্রেম, যৌনতা মানে হচ্ছে যে কৃত্রিম তৈরি করা পুরুষ-তন্ত্র সমাজে আঘাত দেওয়া সেটা আমরা বেশ কয়েকটি

উপন্যাসের চরিত্রে দেখি, আসলে এগুলো লেখিকাদের ক্ষীণ স্বর সমাজ ভাঙ্গার প্রচেষ্টা যেটা চরিত্রে দেখা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে অনেক উপন্যাসে সমকামিতা ব্যাপারটি দেখানো হয়েছে। যেমন 'শামুক খোল' উপন্যাসে দেখি। বুলা অল্প সংখ্যক (১টা সংখ্যা) চরিত্রটি থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ ,কারণ তার মাধ্যমে লেখিকা সমাজের যৌন সম্পর্কিত ধারনাকে ভাঙার চেষ্টা করেছেন। একজন ছেলে যার চরিত্রে প্রথম থেকে একটু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সে কিভাবে স্কুল থেকে সমকামী হয়ে উঠল, পুরুষ হয়ে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, তাদের মধ্যে ভালোবাসা খোঁজা, শারীরিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি। যেমনটি- তিলোত্তমা মজুমদারের 'শামুক খোল' উপন্যাসে বুলা চরিত্র দেখি,

সে যখন ছোট ছিল, তার এই মেয়েদের মতো চলন-বলন যে কোনও মেয়ের চেয়েও মেয়েলি হয়ে দেখা দিত। তার মা বেশ্যা পাড়ারই এক মধ্য বয়সিনী, চার সন্তানের জননী – তার নাম রেখেছিল বুলা । সে জানে না, তারা চার ভাইবোন একই পুরুষের সন্তান কিনা। না হাওয়াই সম্ভব। (তিলোত্তমা মজুমদার,শামুক খোল, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪১১, পৃ: ২৮৩)

দেখে-দেখেই চমৎকার নাচ শিখেছিল সে। তার শরীরে আছে মেয়েলিপনা। ছিপছিপে, ফর্সা, টানা টানা নাক-চোখের কারণে, কোঁকড়ানো মাথা ভর্তি চুলের মহিমায়, সে জানে সে আকর্ষণীয়।... মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সে পছন্দ করে কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার কোনও যৌন আকর্ষণ নেই। নিজের আনন্দের জন্য সে চায় সুদর্শন ছিপছিপে পুরুষ। যেমন এই শুভদীপ ছেলেটি। (তদেব, পৃ:২৮৩) ভাল নাচ করে বলে একটি হিজড়ের দলের মধ্যমণি হয়ে বহুবার লগানে গিয়েছে সে। বিহারের নানা অঞ্চলে ঘুরেছে।... সে হিজড়ে নয়, সে জানে। লিঙ্গ পরিবর্তন করতেও সে চায় না। সে সমকামী। ... অর্থবান বিহারিদের আঙিনায় নাচ দেখানো, প্রায় ভিক্ষের মতো লাগতো। (তদেব, পৃ: ২৮৩)

বুলা শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে হয়ে ওঠে নারী আকাঙ্ক্ষা করার মতো আর কিছুই তার জীবনে নেই। একজন মনের মতো মানুষ ছাড়া আর কী-ই বা সে চাইবে! বাড়ি আছে, অর্থের অভাব নেই, পেশাগুলির প্রতি তার কোনও অভিযোগ নেই। সে কোনও বাবা হতে পারবে না। মা-ও না। কেউ তার স্ত্রী হবে না কখনও, স্বামীও হবে না। সে শুধু পেতে পারে মানুষ একজন। পুরুষমানুষ। বন্ধু। যৌনতার অংশীদার। জীবনের অংশীদার।... একাই সে পুরুষদেহী পুরুষ- কামনা। (তদেব, পৃ:২৮৪)

শৈশবে তার চলাফেরা ছিল মেয়েদের মতো কিন্তু মনের দিক থেকে সে ছিল সম্পূর্ণ ছেলে। কিন্তু স্কুলে পড়া কালীন দেবকান্তিদা তাকে মেয়ে করে তোলে। তাকে প্রথম ধর্ষণ করে। একাদশ শ্রেণীর দেবকান্তিদা ছলে মিথ্যা কথা বলে সালুকে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। ভয় আই যায় খুব, রাগে, অপমানে, ক্ষোভে, অভিমানে জ্বলে যায়। বেশ কিছুদিন স্কুল যায় না সবাই হাসাহাসি করবে বলে। পরিবারের কাওকে বলতে পারে না তার ধর্ষণের কথা, কারণ তার স্বভাব মেয়েলি দেখে মা তার নাম বুলা রেখেছিল। কিছুদিন পর আবার স্কুল যাওয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেই দেবকান্তিদার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাকে ভাল লাগতে শুরু করে, তার প্রতি ক্রোধ কমে যায় ও তার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো লাগে এবং সে ধীরে ধীরে সমকামীতে পরিণত হয়, এটাকেই সে তার পেশা করে নেয়।

উঁচু ক্লাসের ছেলেরা জড়িয়ে ধরত তাকে। চুমু খেত। একদিন একাদশ শ্রেণীর দেবকান্তিদা তাকে ইস্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যায় । এবং জোর করে তাকে ধর্ষণ করে।... সেই যন্ত্রণাকে কী ব্যাখ্যা দেওয়া যায় সে জানে না। সে শুধু জানে, তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ওই কষ্ট সজ্ঞানে হজম করার নয়।... সে

কাঁদছিল। খুব কাঁদছিল।... সে তখন ওই অবস্থাতেই শুয়ে পড়েছিল মাটিতে। তার আর কান্নারও ক্ষমতা ছিল না কারণ যন্ত্রণায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল।... তার সতীচ্ছদ টুঁটিয়ে দেবকান্তিদাই তাকে করে তুলেছে পরিপূর্ণ নারী।... সে বারো বছর বয়সের বোকামি ও ভীরুতায় নিজেই মুখ বুজে গুটিয়ে ছিল নিজের মধ্যে।... সে সব কিছু মুছে ফেলেছিল গোপনে।... এমনকি দেবকান্তিদাকে অল্প অল্প পছন্দ করতেও শুরু করল সে।... দেবকান্তিদা তার কাঁধে হাত রেখে জিগ্যেস করল, সে দেবকান্তির বাড়ি যাবে কিনা। সে না করতে পরল না।... তারপর থেকে ভাল রেস্তোরায় খাওয়ার বিনিময়ে, টি-শার্ট বা ক্যাসেট প্রাপ্তিতে, কিংবা চলচিত্র দেখানোর শর্তে সে তার পেশা চালিয়ে যেতে থাকল। (তদেব, পৃ:২৮৪)

বুলার মা পেশায় বেশ্যা বৃত্তি করতো, তারা তিন বোন এক ভাই, সে মাকে দেখেছে কত কষ্টে ঘর চালিয়েছে। পরবর্তীকালে বিনোদবাবুকে ধরে তার মা আর বেশ্যা বৃত্তিতে যায় না। তাদের দুজনের ভালোবাসায় সে মুগ্ধ ছিল । কিন্তু সে জানে তার জীবনে কখনও এমন মুহূর্ত বা ঘটনা ঘটবে না কারণ, সে কোনও নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, বরং পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং এটাকেই সে পেশায় পরিণত করে।

তাঁদের ব্যবসায়ী স্বামীরা ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ। হুট করতেই দেশে বিদেশে চলে যান। উপবাসী ও উপেক্ষিতা স্ত্রীরা তখন পুরুষ খোঁজেন। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়। শুধু দেহ। তাঁর দেহ খোঁজেন।... এক-একটি বাড়িতে কয়েকজন মহিলা সমবেত হন। সেখানে মঞ্চের মতো নাচের জায়গা করা হয় । সেই মঞ্চে সে নাচতে নাচতে একটি একটি করে পোশাক খুলতে থাকে। শর্ত, কেউ তাকে স্পর্শ করতে পরবে না । একঘণ্টা নাচের জন্য কুড়ি হাজার টাকা। (তদেব, পৃ: ২৮৩)

তার কাছে অনেক বাধা-ধরা খদ্দের আসে তার ফ্লাটে কিন্তু তাদের সঙ্গে তার কেবল শরীরের সম্পর্ক আর টাকার। রাস্তাঘাটে দেখা হলেও তারা এড়িয়ে যায়, তাদের অনেকে আবার বিবাহিত। তার কাছে যারা খদ্দের হয়ে আসে এখন, বেশির ভাগ চেনা হয়ে গেছে। দূরভাষে সময় নির্দিষ্ট করে নেয় সে।... পেশাগত যৌনতার সময় তার নিজের পছন্দের কোনও জায়গা নেই। সে চায় পরিচ্ছন্ন লোক।... এদের কারও প্রতি তার ভাললাগা মন্দলাগা নেই। এদের দেহে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এদের ইচ্ছে-অনিচ্ছাতেও সে অভ্যস্ত। গোটা খেলায় তার আছে কিছু নিয়মানুগ প্রক্রিয়া।... তার আগে অবশ্য নিজেকে পোশাক-মুক্ত করে নেয় সে। (তদেব, পৃ:২৮২)

সেও শরীরের ব্যবসা করে তবুও নিজেকে বেশ্যাদের থেকে আলাদা ও উন্নতমানের মনে করে। সে বেশ্যা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ করে, তাদের শারীরিকভাবে সচেতন করার চেষ্টা করে। যৌন বৃত্তি হলেও সে যৌনদাস নয়।... একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করে সে। ভাল মাসহারা পায়। পড়ায় সে যৌনকর্মীদের। নিরক্ষরকে অক্ষর চেনায়।... তাদের শরীরে থিকথিকে রোগ। থিকথিকে অপুষ্টি।... ইদানীং মড়কের মতো ঢুকে পড়ছে এডস। ভয়াল, ভয়ঙ্কর, এডস। সে শুধু বোঝাবার বোঝাবার চেষ্টা করে।... সকলেই কন্ডোম পরার দাবি জানালে, যারা আসে, তারা বাধ্য হবে।... বেশ্যার দল হেসে-হেসে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। বলতে থাকে, এবার থেকে বাবুদের টুপি পরিয়ে বসাবে তারা। টুপি পরালে শিশ্নসমূহ কীরকম বেড়ালের ল্যাজের মতো নরম হয়ে যায় তারা আলোচনা করে।... তার জিভ আটকে যায়। এইসব বেশ্যাদের মতো সে নিজেকে রাখতে পারে না কুঠুরি বদ্ধ জীবনে।... শুধু দেহানুরঞ্জন। বিনিময়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। পেট পুরে খেতে পর্যন্ত পায় না সব।... যেমন তার নিজের বাড়ছে ব্যাংকে জমানো টাকার

পরিমাণ। কিন্তু তাতেও, সে দেখেছে, এই সব মেয়েদের জন্ম খিদে একটি সংসারের জন্য। স্বামীর জন্য। সমাজের স্বীকৃতির জন্য।... যৌন কর্মীদের তারা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত করতে চায়। হাজার বছরের পুরনো এই বৃত্তি টিকে আছে ঘৃণিত হয়েই। এই ঘৃণা মুছতে চলে যাবে আরও হাজার বছর। (তদেব, পৃ:২৮১,২৮২)

কিন্তু উয়ান্যাসের নায়ক শুভদীপকে দেখে যেমন সে শারীরিকভাবে আকর্ষিত হয়, তেমনি আবার মানসিকভাবে গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। অসুস্থ শুভদীপকে ঘরে নিয়ে আসে সে, শুভ সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে অনেকভাবে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু শুভ তাকে প্রত্যেকবার প্রত্যাখ্যান করে ও দূরে ঠেলে দেয়। জীবনে প্রথম নিজেকে পুরুষ হওয়ার জন্য ধিক্কার দেয়, নারী না হওয়ায় আফসোস হয়। সে গিয়েছিল কন্ডোম কিনতে। কন্ডোম ফুরিয়ে গেছে তার। কন্ডোম ছাড়া সে কারোকেই কখনও গ্রহণ করে না। ছেলেটিকে দোকানেই দেখেছিল সে। আর দেখামাত্রই ভাল লেগেছিল তার , চিকণ শরীর। গালে মাখা বিষণ্ণতা।... সে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।... সে তখন তার পিঠ বরাবর দাঁড়ায় এবং ছেলেটির নিতম্বে চাপ দিতে থাকে। একবার ঘর ঘুরিয়েছিল সে। বলেনি কিছুই।... সে দেখে পুরুষটির রুচিবোধ। গড়ন। পরিচ্ছন্নতা। বলিষ্ঠ, রুচিবান ও পরিচ্ছন্ন পুরুষরাই একমাত্র লাভ করে তাকে। (তদেব, পৃ:২৮১)

গোটা পৃথিবী কাম দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ মরণ মূহুর্তেও এক-একজন জাগ্রত কামুক।... ছেলেটি যখন অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়, সে ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আশ্চর্য শান্তিতে ভরে গিয়েছিল শরীর।... তাকে বিছানায় শুইয়ে জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল যখন, খোলা শরীরের সৌন্দর্য তাকে পরিপূর্ণ মুগ্ধ করে। (তদেব, পৃ:২৮৩)

ছেলেটি পাঞ্জাবী খুলতে চায়। আর মেয়েলি হিল্লোল তুলে সে বারণ করে তাকে।... কিন্তু পারে না কিছুই। শুধু ইচ্ছেরা সংগোপনে মাথা কুটে মরে।... নারীসুলভ পুরুষের শরীর তাকে জাগাতে সক্ষম হয় না।... এমনকি চা পানের অনুরোধও ঠেলে দেয় সে।... সে চূড়ান্ত হতাশায় ভাল-লাগা ছেলেটিকে চলে যেতে দেয় । ছেড়ে দেয়। গেঞ্জির কথা বলে না কারণ, এ দিনের স্মৃতি হিসেবে সে রেখে দেবে ওই বাস। এ কি স্বাভাবিক? সে ভাবে। হয়তো স্বাভাবিক নয়।... পুরুষ হয়ে পুরুষকে কামনা না করে সে যদি নারী হয়ে পুরুষকে কামনা করত, তবে এই দুর্ঘটনা, স্পর্শ, শুশ্রূষা- কাহিনী হতে পারত। এই প্রথম, নারী নয় বলে কষ্ট হয় তার।... ছেলেটি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ চেপে ধরে সেই হাত। ট্যাক্সি চলার উপক্রম করে আর সে ছেলেটির হাতে চুম্বন এঁকে দেয় । বিদ্যুৎস্পৃ ষ্ট হয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় ছেলেটি। ট্যাক্সি চলতে থাকে।... মেলে দেওয়া গেঞ্জিটি হাতে নেয় সে। গন্ধ শোকে। নতুন পুরুষের গন্ধ।... পাবার সম্ভাবনাও নেই। আফসোস হয় তার। (তদেব, পৃ:২৮৫)

মহিলা লেখিকার মহিলা চরিত্রর মাধ্যমে যৌনতার কথা উচ্চারণ বহু হয়েছে, কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের ভাষায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তারা যৌন আকাঙ্ক্ষার দিকটি বেশি গুরুত্ব দেন, আবার অনেকে এই গুরুত্বের মধ্যে পুরুষ-তন্ত্র সমাজের সামাজিক অনুশাসনকে লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেন তাদের লেখায়, যেমন- তিলোত্তমা মজুমদারের ‘প্রহান’, ‘শামুক খোল’ উপন্যাসে দেখি, সমাজের যে নিয়ম, অনুশাসন বা কৃত্রিম অনুশাসন ভাঙার চেষ্টা, বয়:সন্ধির মেয়েরা যারা এই যৌনাঙ্গ বিষয়ে জানেনা; তাদের অর্থাৎ কমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাবধান করার প্রচেষ্টার সাথে সমাজের তৈরি অনুশাসন ভাঙার ক্ষীণ স্বর শোনা যায়, ‘প্রহান’ উপন্যাসে।

'প্রহান' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রী, সে তার বাবাকে তার যৌনসঙ্গী হিসাবে পাওয়ার কামনা করে, তীব্র ভালোবাসার টান অনুভব করে। বাবা তুল্য একজনের সঙ্গে সম্পর্কে গর্ভবতী হয়ে ওঠে। বাবা-মেয়ের সম্পর্ক সমাজ কিছু অনুশাসন দিয়ে বিশেষ করে তুলেছে, তার বাবা অবশ্য সামাজিক অনুশাসনেই গড়ে ওঠা একজন আদর্শ বাবা। শ্রীর আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে চরম অবৈধ, পাপ কামনা বলে মনে হয়েছে। তাই তিনি বাধ্য হয়েছেন নিজের আদরের একমাত্র সন্তানকে হত্যা করতে।

(সুজয় ও শ্রী)

একজন মানুষের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক কী হবে তার সংজ্ঞা আলাদা করা আছে। কে করেছে বাপি? মানুষই তো? আমি মানুষের এই সব বিধান মানি না। আমি একজন নারী। আমি স্বাধীন। সম্পূর্ণ। আমার ইচ্ছেমতও কোনও পুরুষকে পাবার অধিকার আমার আছে।... পিতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্ক, মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক, বোনের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক। এমনকি বন্ধুর সঙ্গে বান্ধবীর।... মানুষের সভ্যতার এটাই অবদান। এটাই মাধুর্য। সুন্দর ও কল্যাণ মানুষের সম্পর্কে নিহিত। তোমাকে তা বুঝতে হবে। ....এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতি পিতা জানে না, ভাই জানে না, বন্ধু জানে না। (তিলোত্তমা মজুমদার, প্রহান, শারদীয় দেশ, ১৪১০, পৃ:৩৫৩)

(শ্রী, সুজয়)

শ্রী, সম্পূর্ণ খোলা, বলতে থাকল-এসো বাপি। নাও।...তাঁর কন্না পাচ্ছে।...এমন করতে নেই ।জামা পরো।... আমি পাগল হয়ে আছি বাপি। তুমি বলেছিলে ভালবাসবে।... সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীর গলা টিপে ধরেছেন। বলছেন- তুই আর তোর মা এই পৃথিবীর ময়লা।... তোদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।... তোরা মানবসভ্যতার কলঙ্ক। (তদেব, পৃ:৩৫৭)

এই 'প্রহান' উপন্যাসে রাগিণী ও শ্রী সম্পর্ক মা ও মেয়ে। তাদের দেখে মনে হয় যেন, একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক নারী হওয়ায় নারী-স্বাধীনতার তাৎপর্যকে যেন যেমন খুশি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে যাবার স্বাধীনতা মনে করে। তাদের ভাবনায় অন্য যে কেউ হতে পারে যৌনসঙ্গী বাবা,কাকা; যে কোনও বয়সের হতে পারে। একই পুরুষের সঙ্গে মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক।

(সুজয় ও শ্রী)

মা আঁকছে। আমাকে বলেছে সারা রাত আঁকবে। কেউ যেন ডিসটার্ব না করে। একজিবিশন চলে এলো তো! ইন্সপিরেশন আছে।... ছবি নিয়ে মার অনেক স্বপ্ন, না বাপি? হ্যাঁ। অনেক। সারা দেশে ওর নাম ছড়িয়ে যাবে... রাগিণী ও শ্রী দু'জনেই মনে করেন, আঁকিয়ে হিসেবে তাঁরা অসাধারণ ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার অধিকারী। (তদেব, পৃ:২৯৩)

(শ্রী)

মার আঁকাগুলো সমসাময়িক মানুষ নিতে পারছে না। অথচ আমি –আমি নতুন প্রজন্মের তো? মায়ের ছবি আমাকে দারুণ টানে। দারুণ প্রেরণা দেয়। তার মানে তোমাদের জেনারেশন মার প্রতিভাকে উপলব্ধি করতে পারছে না। মা মায়ের সমসময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। তাই মার একাকীত্ব বেশি। যন্ত্রণাও। (তদেব, পৃ:২৯৪)

নাম খ্যাতি পাওয়ার জন্য রাগিণী স্বামী ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা করে বেড়ায়, বাড়িতে সারারাত অন্য পুরুষ নিয়ে থাকে, কাওকে মানে না, স্বামী-সন্তান কাউকে নিয়ে ভাবে না, সমাজকে তোয়াক্কা করে না, কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হলে, না কোনও চিন্তা, না মানসম্মান হারানোর ভয়, বরং মেয়েকে তিরস্কার করে- গর্ভ নিরোধক পিল ব্যাবহারের কথা বলে। মাতৃরূপের যে আদর্শ আছে সমাজে, রাগিণী যেন একুশ শতকের বাঙালি মায়ের আদর্শকে ভাঙতে চাইছে, নারী মানে সন্তানকে জন্ম দেবে, লালন-পালন করে বড় করে তুলবে, তাদের আগলে রাখবে, ঘর-সংসার গুছিয়ে রাখবে, আদর্শ স্ত্রী ও মা হয়ে উঠবে- এই ধারনাটি ভাঙার চেষ্টা। এককথায় সমাজের তৈরি আদর্শ নারীর concept কে ভাঙার প্রচেষ্টা দেখা যায় চরিত্রগুলিতে অথবা লেখিকারা তাদের সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে সেই সমাজের আদর্শকে আঘাত দেবার প্রচেষ্টা।

(সুজয়)

রাগিণী, আমি তোমাকে অনিরুদ্ধ কাঞ্জিলালের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনব। তুমি আপন কৃতিত্বের শিল্পী হও। তুমি আমার স্ত্রী হও।... তোর মানসিক নৈরাজ্য সুশৃঙ্খলতা সাজব আমি। (তদেব, পৃ:৩৫৫)

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে টের পান,তাঁর পরিবারের মধ্যেও ঢুকে আসে একাধিক পরিবার। মেয়ে আর মা যার অন্তর্গত। সেখানে তিনি নিজেকে খুঁজে পান না অনেক সময়। বিশেষত, তিনি লক্ষ করেছেন, যখন মেয়ে বা মা বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়েছে তখন তাঁর মতামত অবহেলিত কিংবা তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত। কিংবা সরাসরি অস্বীকার। (তদেব, পৃ:২৯৮)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সারদা দেবী পনেরোটি সন্তানের জন্ম দেন। সে যুগের মায়েদের অনেকেই বহু সন্তানবতী হতেন । এখনকার সময়ে দুটি অথবা তিনটি, তার বেশি বাচ্চা হবে না এই রকমই সরকারি বিধি। চীন দেশে তো সংখ্যাটা আরও কমে গেছে। এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারী নীতির পক্ষে- প্রধান যুক্তি হল অর্থনীতি। জনসংখ্যা বেশির ফলে দারিদ্রতা দূর করা কঠিন হয়ে উঠেছে। শিল্পোন্নত দেশে সমস্যাটা একটু আলাদা, সেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কোনও সরকারী নীতির প্রয়োজন নেই। অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে, যেমন পশ্চিম জার্মানিতে গত তিরিশ বছরে সেখানে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত তালে কিন্তু জনসংখ্যা আর বাড়ছে না।

গর্ভমোচন এবং গর্ভ নিরোধের মৌল অধিকার নারী মুক্তি আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দাবি। এই দাবির একটা আর্থিক দিক আছে ঠিকই, কিন্তু দাবিটা দরিদ্র পরিবারের পক্ষ থেকে আসেনি। পাশ্চাত্য দেশে বা সমাজে এই ভাবনাটা এসেছে উদার পূর্তির প্রয়োজনে নয়, বরং নারীর বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে। আজকের দিনের মেয়েরা চাইছে বাইরের জগতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে, আরও অবাধ বিচরণ করতে। সন্তান সংখ্যা বাড়লে তাদের সেই স্বাধীনতা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আজকের নারী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত করে রেখেছেন। আর্থিক স্বাধীনতা এবং বৃহত্তর সামাজিকও স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এই দাবি। নারী গর্ভ ধারণ করবে কিনা, অথবা করলে কখন করবে এটা আর নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না, নিয়তির নামে পুরুষের হতেও ছেড়ে দেওয়া যায় না, নাহলে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা চলবে। তাই নারীরা নিজেরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারিণী।

একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে গর্ভমোচন ও গর্ভ নিরোধ এই বিষয়টা পুরুষ-তন্ত্র সমাজের বিরুদ্ধে নারীবাদী আন্দোলনের একটা বড় হাতিয়ার। এই একটা দাবিতে তাদের অনেক কিছু স্বার্থ মেটাতে চেয়েছেন, ১. যৌন সম্পর্কের স্বাধীনতা, ২. নিজস্ব স্বাধীনতা, ৩. বিবাহ ও বাবাহ বিচ্ছেদে সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা। ৪. সাম্য অধিকার দাবি । সমাজের সম্মতিক্রমে বহুদিন ধরে পুরুষেরা যে যৌন স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছে, নারী মুক্তির প্রবক্তা মেয়েদের জন্য সেই স্বাধীনতা চেয়েছেন। এটাকেও নারী পুরুষের সাম্যের দাবির একটা অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যৌন সম্পর্কের স্বাধীনতা মানে গর্ভমোচন ও গর্ভ নিরোধেও স্বাধীনতা – অর্থাৎ পূর্বে পুরুষের সন্তান জন্ম দেবার যে স্বাধীনতা ছিল, সেটা ক্ষুণ্ণ করা। নারীরা বছরের পর বছর ঘর-সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে অন্ধকার অন্তরালয়ে পড়ে থাকবে, সন্তানের পর সন্তান জন্ম দিয়ে যাবে, তাদের লালন-পালন করবে, আদর্শ মা হয়ে উঠবে। তারা অবলা, বেচারি হয়ে থাকবে আর পুরুষ যা বলবে বাধা-নিষেধ একতরফা চাপিয়ে দেবে নারীর ওপর, নারী তা মাথা পেতে সব মেনে নেবে-এই ছিল প্রাচীন সমকালের বাস্তব সত্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারীরা অনেক বেশি শিক্ষিত, সচেতন বাস্তবমুখী, কল্পনা প্রবণতা, ভাবুকতা কম, তারা চাকরি করে, আর্থিক স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, ছেলেদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলছেন, তাদের এই বাইরের জগতে ছেলেদের পাশে কাজ করতে গিয়ে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, কাজ করতে হবে অথচ ছেলেদের জন্য এক নিয়ম আর নারীদের জন্য অন্য নিয়ম –এই বিষয়টিকে তারা যখন বুঝতে শিখেছে- বিষয়টিকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি, করেছে তীব্র লড়াই, অংদলন ও প্রতিবাদ- সফলও হয়েছে। নারীদের শিক্ষিত করে তাদের সজাগ করা ছিল উদ্দেশ্য, তারা যেন নিজ শরীরকে ভালবাসতে পারে সেটা সেখান ছিল বড় কাজ, তার অনেকাংশে সফল হয়েছেন। একজন নারীর কাছে গর্ভমোচন ও গর্ভ নিরোধন বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সঙ্গে নারীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠার ব্যাপার থাকে। যৌন সম্পর্কেও স্বাধীনতা অর্জন করা হয়ে ওঠেছে, তারা অনেক বেশি নিজ কেরিয়ারে ফোকাস করতে পারে ও পুরুষতুল্য হয়ে ওঠে তাদের মত অধিকার অর্জন করতে চায়। গর্ভমোচন ও গর্ভ নিরোধক নারীবাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একবিংশ শতাব্দীর অনেক উপন্যাসে বিষয়টি দেখতে পায়, যেখানে নায়িকা চরিত্রগুলি এত আধুনিক নিজ শরীর ব্যপারে সচেতন যে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রেখেছে যৌন সম্পর্কের এবং গর্ভমোচন ও গর্ভ নিরোধের। তারা নিজস্ব কেরিয়ারে সাফল্য, শারীরিক সৌন্দর্য বজায় রাখা, আত্মনির্ভরশীলতা, ব্যক্তিসত্তা গড়ে তোলার পথে সন্তানকে বাধা করতে চায় না অথবা নিজেকে তারা আর চার দেওয়ালে আটকে রাখতে চায় না, নিজেদের উন্মুক্ত রাখতে চায়। নারীদের পদ বৃদ্ধির সঙ্গে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। আবার অনেকে মনে করেছেন নারীদের যৌন স্বাধীনতা, গর্ভমোচন ও গর্ভ নিরোধক, বিবাহ-বিবাহ বিচ্ছেদ স্বাধীনতাগুলি দিয়ে তাদের আরও বেশি দুশ্চরিত্র করে তোলা হয়েছে। সমাজের কাছে নারী কেবল শুদ্ধ মাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি। প্রচলিত ধারণ ছিল যে, নারীর কোনও যৌন আকাঙ্ক্ষা নেই, নিতান্তই পুরুষের আগ্রহে সে মিলিত হয়ে বংশ রক্ষা করবে অথবা পুরুষের কামনা তৃপ্তি ও বাসনা পূরণ করবে। সন্তান জন্মদান যদি মুক্তিকামী নারীর চোখে অনভিপ্রেত হয়, তবে তার কাছে বিবাহেরও বিশেষ অর্থ থাকে না।

যেমন দেখি তিলোত্তমা মজুমদারের ‘প্রহান’ উপন্যাসে রাগিণী একটি কন্যা সন্তান জন্মদানের পর নিজের দৈহিক সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য এবং নিজের গর্ভ নিরোধক নিজেই থাকার জন্য স্বামীর সঙ্গে আর কোনও যৌন সম্পর্ক রাখে না, এক ঘরে শোয়া বন্ধ রাখে । সে সম্পূর্ণ স্বাধীন অন্য পুরুষের সঙ্গে নিজ যৌন সম্পর্কে।

(সুজয়)

যেহেতু রাগিণী জন্ম রোধক বড়ি খেয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি প্রতিহত করতে পারতেন সেহেতু সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরুষের ব্যবহার্য পদ্ধতি সম্পর্কে সন্দিহান হয় বা নির্ভর করা অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু রাগিণী বড়ি খেতে অনিচ্ছুক। বড়ি একটি মেদ বর্ধক বস্তু। দৈহিক সৌন্দর্য এতটুকু স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাগিণী পাগলের মতো আচরণ করেন।... শ্রীর জন্মের পর রাগিণী তাকে দুধ খাওয়াতে চাননি। শেষ পর্যন্ত, দুধের অভাবে শিশুটি মারা যাচ্ছে - এই সংবাদ পরিবেশন করায় রাগিণী শ্রীকে পান করিয়েছিলেন।... শ্রীর জন্মের পর থেকে সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাগিণীর কোনও স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক ঘটেনি। রাগিণী চাননি তাঁদের আর সন্তান হোক। (তিলোত্তমা মজুমদার, প্রহান, শারদীয় দেশ, ১৪১০, পৃ:২৯৩)

অপরদিকে কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হলেও আধুনিকতার মোড়কে জড়ানো মা মেয়ের গর্ভবতী হওয়ায় না সামাজিক ভয়, না লজ্জা, উপরন্তু মেয়েকে তিরস্কার করেছে গর্ভ নিরোধক পিল না ব্যবহার করার জন্য।

(সুজয়)

(শ্রী, রাগিণী)

আমাকে কেউ জোর করেনি। আমি স্বেচ্ছায় যা করেছি।... তোমাকে তো পিলস নেওয়া শিখিয়েছিলাম। হঠাৎ হয়ে গেল মা!... আমি মা হতে চাই।... প্রকৃতি আমাকে মা হওয়ার অধিকার দিয়েছে।... বিদেশে সিঙ্গেল মাদার হওয়া যায়, আমি কেন পারব না। (তদেব, পৃ:৩৪৩)

আবার দেখি, পারমিতা ঘোষ মজুমদারের 'গন বন্ধন' উপন্যাসে রোহিণী স্বামী অনিকের সঙ্গে বিয়াভ বিচ্ছেদের পর শুভঙ্করের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু শুভঙ্কর বিয়ে করতে চাইলে সে বিবাহে রাজি নয়, তবে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখে ও বন্ধুত্বও। শুভ তাদের ভালোবাসার একটি সন্তান চাইলে রোহিণী তাতে রাজি নয়, সে নিজের গর্ভ নিজেই নিয়ন্ত্রক, এর মধ্যে সে প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়, অথচ শুভকে জানানোর প্রয়োজন মনেই করে না, নিজেই একা গিয়ে গর্ভমোচন করে আসে।

(রোহিণী)

দুপুরে রোহিণী বেরোয় আবার অফিস থেকে। অফিসের কাছে ফার্মেসিতে না গিয়ে ও চলে যায় খানিকটা দূরে।... নাকি রোহিণীদের জেনারেশন এ ব্যাপারে এখনও অতটা খুল্লামখুল্লা হতে পারেনি।... "একটা... পিল দেবেন।" (পারমিতা ঘোষ মজুমদার, গণ-বন্ধন, সানন্দা পুজো, ১৪১৭, পৃ:৪২২)

(রোহিণী, শুভঙ্কর)

"তুমি একা-একা অনেক ডিসিশন নিচ্ছ..." "এটা কেন করলে তুমি? আই ওয়ান্টেড আ চাইল্ড উইথ ইউ... আমি এইটুকু চাইতে পারি না?" "শুভ, আমি এখনও মনস্থির করতে পারিনি অ্যাবাউট আওয়ার ম্যারেজ। তোমায় বললামই তো..." (তদেব, পৃ: ৪৩৭)

শিশুকাল থেকে নারীদের মধ্যে একধরনের অবনমনের বীজ বপন করা হয়। এরজন্য দায়ী অনেকটা পিতৃতান্তিক মতাদর্শ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হল পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও ভাবনার রূপান্তর

করা। একমাত্র সম-অংশী দায়িত্বেই ক্ষমতায়নের ভিত্তি প্রস্তুত হয়। নারীর লড়াই পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পিতৃতান্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বিদ্যমান সমাজে পুরুষের দায়িত্বের পাশাপাশি নারীর দায়িত্ব, পুরুষের অধিকারের পাশাপাশি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সবকাজে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করবে। ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১৭৯ টি দেশের অংশগ্রহণে ১১৫ পৃষ্ঠার একটি প্রস্তাবনায় সাম্য, ন্যায়বিচার, সন্তান ধারণের প্রশ্নে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি বি ক্ষমতায়ন শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন। ক্ষমতায়ন বলতে নারীর স্বাধীনতা ও সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকে বোঝানো হয়। ক্ষমতা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ-বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধি-ভিত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সমাজের প্রতিটি স্তরে আপন মহিমায় স্বাধীন ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠবে। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে বস্তুগত, মানবিক ও জ্ঞান সম্পদের ওপর। বাংলায় নারী জাগরনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারীর শিক্ষা প্রসার এবং দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার তাগিদ দিয়েছিলেন।

ফলে একুশ শতকে নারী পরিচয়ে ব্যক্তি বিশাল। কিন্তু এখানে পৌঁছে ফের ও একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, যে তাহলে কী আমরা ধরেনেবো একুশ শতকের নারী তার চার পাশের সমস্যাকে অতিক্রম করে প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাশালী (empowered) হয়ে উঠেছে?

গ্রন্থপঞ্জী:

1) মৈত্র, শেফালী। নৈতিকতা ও নারীবাদ। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।
2) ইয়াসিন, তাহা; সাদি, অনুপ। নারী। ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৬।
3) ড°বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পুর্ন ইতিবৃত্ত। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬-২০০৭।
4) সেন, নবেন্দু। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৯।
5) চক্রবর্তী, বাসবী। নারীপৃথিবী:বহুস্বর। কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০১১।
6) বসু, রাজশ্রী; চক্রবর্তী, বাসবী। প্রসঙ্গ: মানবীবিদ্যা। কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০১৪।
7) আজাদ, হুমায়ুন। নারী। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩।
8) গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। বঙ্গের মহিলা কবি। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।